বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাংলার মা-মাটি ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ এক নিবেদিতপ্রাণ কর্মঘনিষ্ঠ মানুষ। সর্বজনগ্রাহ্য কোন মতবাদকে প্রায়োগিক অনুশীলনে কার্যকর করার এক জাদুকরী সক্ষমতা ছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। তিনি ছিলেন ইতিহাসের আলোকযাত্রী। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সমবায়ের শিকড়সন্ধানী অভিযাত্রায় আমাদের দেশে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ড. আখতার হামিদ খান চিন্তায় চেতনায় স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হলেও সমবায়ের মাধ্যমে মানবপ্রেম, মানবসেবা ও মানব উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে তারা সকলেই এক বিন্দুতে সমাসীন ছিলেন। বস্তুত এ তিন মহামনীষী স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে আপন প্রতিভায় এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তবে মানুষের কল্যাণে নিবেদিত তাদের চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রের একটি সাধারণ সঙ্গমস্থল হিসেবে আমরা সমবায়কেই সামনে পাই। তারা সকলেই সমবায়কে নিজেদের আদর্শিক চিন্তার আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কর্মক্ষেত্রে এর প্রায়োগিক বাস্তবায়ন করেছেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন তাদের যথার্থ অনুসারী। একটি কথা ভুললে চলবে না, পুঁজিবাদী ব্যক্তি মালিকানা বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়ের যেসব ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সমবায় একটি মডেল হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে, গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার বিকাশে এবং সমাজে সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে সমবায় কার্যক্রমকে অবদান রাখার সুযোগ দিলে তা ফলপ্রসূ হতে বাধ্য। জনগণের সম্পৃক্ততা লাভের মাধ্যমে সামাজিক মালিকানার গ্রহণযোগ্যতা অর্জন এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রগতির 'রূপকল্প' বাস্তবায়নে সমবায়ই হচ্ছে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। স্বীকার করতেই হবে জনগণকে সম্পৃক্ত করে সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সমবায়ের কার্যকারিতা প্রয়োগ করা হলে সুদূরপ্রসারী ও টেকসই উন্নয়নের অফুরন্ত সুযোগের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে জাতির পিতা সমবায়কেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বার বার উল্লেখ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর সংগ্রামী চেতনার আলোকে মনে করতেন যে, সমবায় একটি মানব কল্যাণমূলক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পদ্ধতি যার মাধ্যমে মানুষের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। বঙ্গবন্ধুর এ ভাবনারই স্বীকৃতি আমরা বর্তমান সময়ে এসেও পাই যখন দেখি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠনে সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তার কথা জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছে ২০১২ সালকে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে। এ প্রেক্ষিতে তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব বান-কি-মুন তার বাণীতে বলেছিলেন, 'সমবায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, অর্থনৈতিক মুনাফা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা একই সঙ্গে অর্জন সম্ভব।' আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা (আইসিএ)-এর সভাপতির ভাষায়- 'সমবায় মানুষের চাহিদা মেটানোর কাজ করে-লোভ মেটানোর কাজ করে না'- এসব কথা বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন বলে আমরা মনে করতেই পারি। বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন সমবায় সমিতি একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয়। সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে থাকে- গণতন্ত্র, অর্থনীতি, সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা, উৎপাদনের কর্মযজ্ঞ, সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রয়াস- সর্বোপরি সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন সমবায় একটি আন্দোলন ও চেতনার নাম- একটি আদর্শ ও সংগ্রামের নাম। ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হলেও সমবায় সমিতি কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নয়। সমিতিতে শেয়ার ক্রয় করে মুনাফা অর্জন করা সমবায়ীদের প্রধান লক্ষ্য নয়। সাতটি মৌলিক নীতিমালার ওপর নির্ভর করে সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, সেখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ, উন্মুক্ত সদস্য হওয়ার সুযোগ, শিক্ষা প্রশিক্ষণ, তথ্য বিনিময় এবং সমাজকে সম্পৃক্ত করে উন্নয়ন হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য।

বঙ্গবন্ধু সমবায়কে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। তিনি গণমুখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারিত চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যের মধ্যে। সেই ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ- সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতির গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ।' দেশের প্রতি-জনগণের প্রতি-দেশের জনগণের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর গভীর দায়বদ্ধতার কথাই এখানে আমরা বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনে খুঁজে পাই '...আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে নায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল-ভোগের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুণে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে একটি সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সমবায় ছিল শোষক-গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারি স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে ওই ধরনের ভুয়া সমবায় কোন মতেই সহ্য করা হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনা- দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর, কোন আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির ওপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলো যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে ওঠে। জেলে সমিতি, তাঁতি-সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে তাঁতি, কৃষকের সংস্থা হয়- মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে। যদি আবার সেই কোটারি স্বার্থ সমবায়ের পবিত্রতা নষ্ট করে, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, আমরা পুরনো ব্যবস্থা বাতিল করে দেব। আমার প্রিয় কৃষক মজুর জেলে তাঁতি ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নতুন ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারি স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাত করে দেবে।' দেশজ উন্নয়ন ছিল বঙ্গবন্ধুর একান্ত ভাবনা। কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পকে তিনি সমবায় ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সাধারণ নির্বাচনের আগে ১৯৭০ সালের নবেম্বরে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর বেতার টেলিভিশন ভাষণ থেকে আমরা জানতে পারি বঙ্গবন্ধুর সমবায় চিন্তা। তিনি বলেছিলেন- 'ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতিদের ন্যায্যমূল্যে সুতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্য অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণদানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।' ছোট ছোট চাষীর কথাও তিনি বিস্মৃত হননি। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশনে ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'ছোট ছোট চাষীর অবশ্যই উৎপাদনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এ কথা মনে রেখে আমরা পল্লী এলাকায় সমবায় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি। এর ফলে চাষীরা কেবল আধুনিক ব্যবস্থার সুফলই পাবে না বরং সমবায়ের মাধ্যমে সহজ শর্তে ও দ্রুত ঋণ পাওয়া সম্ভব হবে।'

বঙ্গবন্ধু জানতেন শুধু উৎপাদন করলেই চলবে না, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবস্থাও সুসংহত করতে হবে। প্রয়োজন রয়েছে সুষম বণ্টন ও সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রেও তিনি সমবায় ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর প্রয়াস নেন। ১ মে ১৯৭২ সালে শ্রমিক দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ভাষণে তিনি তাই বলেন- আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন করেছি। পাশাপাশি দুঃখী জনগণের অভাব মোচন ও দুর্দশা লাঘবের জন্য আমাদের সাধ্যমতো আশু সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সুদসহ কৃষকদের সমস্ত বকেয়া খাজনা ও পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির কর চিরদিনের জন্য বিলোপ করা হয়েছে। লবণ উৎপাদন করতে আর আবগারি শুল্ক দিতে হবে না। নির্যাতনমূলক ইজারাদারি প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছে। সরকার প্রায় ষোলো কোটি টাকার টেস্ট রিলিফ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছে। দরিদ্র চাষীদের দশ কোটি টাকার তাকাবি ঋণ, এক লাখ নব্বই হাজার টন সার, দু'লাখ মণ বীজধান দেয়া হয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে চার কোটি টাকা বিতরণ করা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের সমগ্র পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে রয়েছে বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা। ইতোমধ্যেই বেসরকারী ডিলার, এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তারা অসাধু ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ না করে তা হলে তাদের সকল লাইসেন্স-পারমিট বাতিল করে দেয়া হবে। আশু ব্যবস্থা হিসেবে সরকার প্রতি ইউনিয়নে ও সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সমবায় ভিত্তিতে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে বেসরকারী ব্যক্তিদের বণ্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সাময়িক স্বল্পতার সুযোগে যুক্তিহীন মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধ হবে।'

বঙ্গবন্ধু সমবায়কে দেখতেন নতুন সমাজ-আদর্শ সমাজ-দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার হাতিয়ার হিসেবে। তিনি দুর্নীতির কথা জানতেন-দুর্নীতিবাজদের কথা জানতেন-সমাজের পচনের কথা উপলব্ধি করতেন। এর থেকে মুক্তির জন্য তিনি সমবায় পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাই তো ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী ঘোষণাকালে বলেছিলেন- 'আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয় সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায় সে দুর্নীতিবাজ। যে স্মাগলিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে ব্লাক মার্কেটিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে হোর্ড করে সে দুর্নীতিবাজ। যারা কর্তব্য পালন করে না তারা দুর্নীতিবাজ। যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে তারাও দুর্নীতিবাজ। যারা বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে তারাও দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। সমাজ ব্যবস্থায় যেন ঘৃণা ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই, যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানীদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি আপনাদের সমর্থন আছে কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব, তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভ হবে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি ইনশাআল্লাহ এদিন থাকবে না। আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর ওপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে।'

বঙ্গবন্ধু সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে দলীয় চেয়ারম্যান জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ থেকে আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত পাই। তিনি বলেছিলেন- 'আমরা নতুন ল্যান্ড সিস্টেম-এ আসতে চাচ্ছি, আমরা কো-অপারেটিভ-এ আসতে চাচ্ছি। দিস ইউনিয়ন কাউন্সিল ওল্ড ব্রিটিশ ইউনিয়ন কাউন্সিল। যেখানে যা দেয়া হয়, অর্ধেক থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে সাফ। সে জন্য একমাত্র উপায় আছে যে, আমরা যে মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ চালু করতে চাচ্ছি এটা যদি গ্রো করতে পারি আস্তে আস্তে এবং তাকে যদি আমরা ডিসট্রিক্ট এবং থানা কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে দেশের মঙ্গল হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।' বঙ্গবন্ধু বাংলার উন্নয়নে গ্রামে গ্রামে গ্রাম সমবায় গড়তে চেয়েছিলেন। গ্রাম সমবায় ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের সোপান রচনা করতে চেয়েছিলেন গ্রাম সমবায়ের সফল বাস্তবায়নের দ্বারা।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন ইতিহাসের বরপুত্র। তিনি ইতিহাসের গর্ভ থেকে উৎসারিত প্রদীপ্ত শিখা যিনি অতীতের আদর্শ-নির্যাস নিয়ে বর্তমানকে জারিত করে ভবিষ্যত বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। আমরা ইতিহাস থেকে জানি, ভারতীয় উপমহাদেশে একসময় ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থা (Self Sufficient Village System) যেখানে এক একটি গ্রাম ছিল উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামের বাইরে থেকে খুব কম জিনিসই আসত। গ্রামের লোকজন মিলিতভাবে তাদের উৎপাদন-বণ্টনসহ সব সমস্যার সমাধান করত। এটা মিলিত প্রচেষ্টার একটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে প্রমাণিত। প্রাচীন ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা করার কথা জানা যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থে চারটি সমবায় সংঘের উল্লেখ আছে : কাঠশিল্পী, ধাতুশিল্পী, চর্মশিল্পী এবং চিত্রকর সমবায় সংঘ। মৌর্যদের অধীনে একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পর উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে গড়ে শিল্পী সমবায় সংঘ। মৌর্য আমলে সমবায় সংঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গুপ্তযুগে সমবায় কর্মকান্ড আরও শক্তিশালী হয়। এসব সমবায় সংঘ অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণের পাশাপাশি কিছু বিচার নিষ্পত্তি এবং প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করত। গ্রামের উন্নতির জন্য সমবায়ভিত্তিক ব্যবস্থা ছিল। গ্রামে পুকুর, খাল ইত্যাদি সমবায়ের মাধ্যমে খনন করা হতো। ঐতিহাসিক এ পরম্পরায় বঙ্গবন্ধু সমবায়কে বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন। গভীর মমতা ও ভালবাসায় তাই তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, 'আমি যদি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারি, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দুঃখী, আর যদি দেখি বাংলার মানুষ পেট ভরে খায় নাই, তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না। এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।' আর বঙ্গবন্ধুকন্যার হাতে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন জয়রথের উন্নয়নযাত্রা প্রত্যক্ষ করে দেশের আপামর জনসাধারণ আশ্বস্ত হতে পারছে এ ভেবে যে, তিনিও বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার বজ্রকঠিন শপথে বলীয়ান হয়ে তাঁর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন; একর পর এক জনকল্যাণমুখী সাফল্যে আমরা এগিয়ে চলেছি তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বে। যার সারৎসার আমরা খুঁজে পাই তাঁর অনেক ভাষণে।